সোমবার ১৭ বৈশাখ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ১৩৩

আজ মে দিবস, সেই উন্মাদনা শ্রমিকদের মধ্যে আর নেই

আজ ১ মে, মে দিবস, এই দিনটি সব শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র দিবস। এই দিনটির জন্য সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ তাকিয়ে থাকে। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ এই দিনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এসেছে। কি বছর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার ডাকে শ্রমিক-কর্মীদের মিছিল ও সমাবেশ মে দিবসকে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু মে দিবসের সেই উন্মাদনা ক্রমশ কমছে। এর বড় কারণ কাজের ধারা পাল্টে যাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে শ্রমিকদের চরিত্র। একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সেই ধার ও ভার আর নেই বললেই চলে, এখন চুক্তিবদ্ধ কাজ, চুক্তি শেষে কাজ নেই। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী এবং গোপনে হাত মেলায় নিয়োগকারীদের সঙ্গে। এটা অত্যন্ত বেদনার এবং হতাশার।

কাজের ঘণ্টা কমাবার আন্দোলনের সঙ্গে মে দিবসের জন্ম-কাহিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘণ্টার কমাবার দাবিতে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হয়। মে দিবসের জন্মভূমি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দাবি ছিল ১৮৮৬ সালে ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টাকেই কাজের দিন বলে আইনত গণ্য করতে হবে। শুরু হয় ধর্মঘট। তপ্ত হয় শিকাগো ধর্মঘটের চেহারা এবং হে-মার্কেটের ঘটনা। মে দিবস আজ আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত। কেবল ছুটির দিন হিসাবে যেন এই দিনটি পালিত না হয়।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি)—''বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য——হচ্ছে হবে——টিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত খুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।

'' কোনও ছায়া কতদিন ধরে খাটছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেত্রে আর আসছে না। মনে রোখ নাই! আবার কেউ দু চার দিন পরেই——আজ জল আনবো ত ছাড়াবো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যায় সময় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,——'দে এখন তেল দে নাইবো।' নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

''একজন পরিবার বল্লে, 'আমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হলো না! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী,-----এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

''সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বল্লে 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারবো। এই দেখ, —আমি চল্লুম।'

''সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে——সেই অবস্থায়——কাঁধে গামছা——বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।''

''আর এক রকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তার পর একখানা চিঠি এলো——'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।''

''সংসারের জ্বালা ত আছেই!——মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পারছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে না ঃ-----বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত দিয়ে জল পড়ছে, —মেরামতের টাকা নাই।''

''তাই ছোকরারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে?''

(মহিমার প্রতি) '' তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার ঃ সাধুদের কত কষ্ট! একজনের পরিবার বললে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে—কেন? *(ক্রমশ)*

দিনপঞ্জিকা

১৭ বৈশাখ, ভাঃ ১১ বৈশাখ, **১ মে,** ১৭ বহাগ, সংবৎ ৫/৬ বৈশাখ সুদি ৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১।

সোমবার, পঞ্চমী দিবা ঘ ৬।৮ পরে ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৩।৫৯ মিঃ। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৪৯ মিঃ। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ঘ ৬।১৬ পরে ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ৩।২৬ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৬।৮ গতে কৌলবকরণ। অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৫৯ গতে গরকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বাহুর দশা। দিবা ঘ ১১।৪৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃস্পতির দশা, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫০ হতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। **মৃতে**---- দোষ নাই, দিবা ঘ ১১।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৩।৫৯ গতে ত্রিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪৫ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।২৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে।

যাত্রা—নাই।

শুভকর্ম্ম---দীক্ষা। **বিবিধ**---ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৬।৮ গতে রাত্রি ঘ ৩।৫৯ মধ্যে চন্দনষষ্ঠী।

মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ বৈশাখ, ভাঃ ১১ বৈশাখ, **১ মে,** ১৭ বহাগ, ৪ শাবান উঃ ৫।৯, অঃ ৬।১ সোমবার, পঞ্চমী দিবা ঘঃ ৬।৮ পরে ষষ্ঠী রাঃ ঘঃ ৩।৫৯

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

কেন্দ্রীয় সরকারের মাওবাদী নীতিতে রয়েছে রণনীতি সংক্রান্ত যথেষ্ট অস্পষ্টতা

সুখমা গণহত্যা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে

হরিহর স্বরূপ

সুখমায় মাওবাদীদের হাতে ২৫ সিআরপিএফ জওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের মাওবাদী নীতিতে বহু ঘাটতি সামনে এসেছে। রণনীতিতে স্পষ্টতার অভাব, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে মাওবাদিদের নিয়ে সমস্যা চললেও তাদের বিরুদ্ধে রণনীতিতে কোনও স্বচ্ছতা না থাকা রীতিমতো আশ্চর্যজনক। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিও সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল,তখন শিবরাজ পাতিল মাওবাদিদের ভাইবোন হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। তার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় মাওবাদিরা গ্রহণ করেছিল। বাড়িয়ে নিয়েছিল নিজেদের সামগ্রিক ক্ষমতা এবং আগুন ছোটানোর বাড়তি যোগ্যতা। ২০০৬ সালে ১৪ দফা এক কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল। যার বিষয় ছিল, রাজনৈতিক, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। কিন্তু, বাস্তবে সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ২০০৯ সালে সরকারি নীতির সারসংক্ষেপ করেছিলেন এভাবে: 'ক্লিয়ার, হোল্ড অ্যান্ড ডেভেলপ'। আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু মনে না হলেও, সেইসূত্রে মাওবাদ সংক্রান্তিত এলাকায় ব্যাপক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যদিও তাঁর এমন মনোভাব কংগ্রেসের সবাই ভালভাবে নেননি। দিগ্বিজয় সিং খোলাখুলি চিদাম্বরমের সমালোচনা করেছিলেন। তার ফলে নিরাপত্তাবাহিনী দোটানায় পড়েযায়।

২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের মাওবাদিদের উদাহরণ দিয়ে দেশের বিপথগামী যুব সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদ এবং নকশালবাদ ত্যাগ করে স্রাতৃত্ব এবং শান্তি অবলম্বন করার আহ্বান জানান। ২০১৫ সালের ৯ মে দান্তেওয়াড়া সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবারও মাওবাদীদের হিংসার পথ ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্দুক ছেড়ে উন্নয়নের চাষ করতে হবে। এগুলি ব্যতিক্রমী অভিমত। কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়তে হবে রণনীতিগত রূপরেখা। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে স্পষ্ট গাইডলাইন অথবা দিগনির্দেশ না থাকায় রাজ্য সরকারগুলি পরিস্থিতি নিজস্ব মূল্যায়ন করে থাকে। সেখানে থাকে না কোনও রণনীতি অথবা পরিকল্পনা।

মাওবাদী সমস্যা মোকাবিলায় ছত্তিশগড় সরকারের সুনাম আছে বলা যাবে না। দেশে সবচেয়ে বেশি মাওবাদী হামলা হয়েছে এখানে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীকে যেরকম সহযোগিতা এই রাজ্যে সরকারের দেওয়া দরকার ছিল, তা দিতে পারেনি। বরং তারা নিজেদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত থেকেছে। সুখমায় ২৫ সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য পুলিশের কতজন আহত হয়েছেন, সেই তথ্য নেই। হতে পারে, তারা সেখানে ছিলই না। অথবা নামমাত্র সংখ্যায় হাজির ছিল। সংবাদ অনুযায়ী প্রায় ৩০০ মাওবাদী গেরিলা হামলা চালিয়েছিল। নিশ্চিতভাবে তারা সেখানে বেশ কয়েকদিন ধরেই ঘাঁটি গেড়েছিল। কেন স্থানীয় প্রশাসন এবং গোয়েন্দাবাহিনী তার বিন্দুবিসর্গ আগাম জানতে পারলো না? এমন গোয়েন্দা ব্যর্থতার কোনও ক্ষমা হয় না।

৭৪ ব্যাটেলিয়ান কিছুটা ট্যাকটিকাল ভুল করেছিল। সংবাদ অনুযায়ী, তারা একসঙ্গে একই জায়গায় বসে মধ্যাহ্নভোজন করতে বসেছিলেন। যে কারণে এত বেশি ক্ষতি হয়েছে। এমন অভিযানে প্রথম শ্রেণির নেতা, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ থাকে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, সুখমার ঘটনা অনুযায়ী সেই প্রয়োজনীয়তার ঘাটতি দেখা গিয়েছে। কারণ, মনে রাখতে হবে, এই সুখমাতেই ১১ মার্চ সিআরপিএফ-এর রোড ওপেনিং পার্টির ১২ জন আইইডি বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিলেন। তা থেকে কোনও শিক্ষাই নেওয়া হয়নি।

ঘটনা হল, এই রাজ্য মাওবাদী হামলার সংখ্যা কমেছে। এক দশক আগে ছত্তিশগড়ে ৩৫০টি হত্যা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮২ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। ৭৩ জন মাওবাদী এবং ৯৫ জন সাধারণ নাগরিক। ২০১৬ সালে মোট সংখ্যা নেমে হয় ২০৭। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ছিলেন ৩৬ জন, ১৩৩ মাওবাদি এবং ৩৮ সাধারণ নাগরিক। সর্বভারতীয় স্তরে, ভৌগলিক এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চল সঙ্কুচিত হয়েছে। ২০১০ সালে যখন এই হামলাবাজদের রমরমা ছিল, তখন ২০টি রাজ্যের ২২৩ টি জেলায় মাওবাদি হত্যালীলা চলত। এখন তা কমে ১৩টি রাজ্যের ১০৬ জেলায় সীমাবদ্ধ হয়েছে। সিপিআই (মাওবাদী)'র সেন্ট্রাল কমিটি এবং পলিটব্যুরো সদস্যরা ধরা পড়েছেন অথবা নিষ্ক্রিয় হয়েছেন। মাওবাদীরা পিছু হটছে। কিন্তু, অস্বীকার করার উপায় নেই, তারা যে কোনও সময় ভয়ঙ্কর হামলা চালাতে পারে। অতীত অনুযায়ী, তারা নতুন করে সংগঠিত হতে পারে, সেইসূত্রে মাথাচাড়াও দিতে পারে। তাই এই ব্যাপারে কোনও গা-আলগা দেওয়ার সুযোগ নেই।

(লেখকের নিজস্ব মতামত)

কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি

মেরি ইজন

পূর্বপ্রকাশিতের পর....

কন্যা নয়, পুত্র--এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় আজকাল পরিবারগুলি কী ভাবে, তা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। বস্তাপচা ধ্যানধারণা নয়, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে কী ধরনের সম্পদ জোগাড় করতে সক্ষম হবে, সেই প্রত্যাশার উপর ভর দিয়ে পরিবারগুলি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করে। সুতরাং, হ্যাঁ, একথা ঠিক যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নিয়েই আমাদের কারবার। কিন্তু এসব চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিবারগুলি এখন শিশুর জন্মদান ও তাদের মানুষ করে তোলার সঙ্গতি নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছে। এ এক খুব গতিশীল ও জটিল সম্পর্ক। এক্ষেত্রে হালের পরিবেশ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ফেলে পরিবারগুলির উপর (বিশদ জানার জন্য দেখা যেতে পারে জন ও অন্যান্যের ২০০৮; ইউএন উইমেন ২০১৫)।

এর আরও মানে দাঁড়ায়, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, উনিশ শতকে আটের দশক অবধি পাওয়া প্রযুক্তিগুলি ছাড়াও, গত কয়েকটি দশকের অন্য কোন ধরনের অগ্রগতি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে? কোন ধরনের পরিবার বিশেষ করে প্রভাবিত? সবার আগে লক্ষণীয় যে, ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ হার বিস্তর বাড়ার সঙ্গে সমাপতন বা মিল আছে কন্যাশিশুর অনুপাত কমে যাবার সময়কালের। অর্থনীতির ব্যাপক বাড়ন্ত এবং ভালোবদল সত্ত্বেও, নির্মম সত্যিটা হল, এই বিকাশ হয়েছে খুব অসম এবং একটু বেশি বয়সিদের জন্য যথেষ্ট নতুন কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে মেয়েদের। কিছুটা সচ্ছল (হতদরিদ্র নয়) পরিবার তাদের আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা কম রেখে। তারা, এক আধটা ছেলেপুলে হলে, তাদের জন্য বিনিয়োগ' করতে পারে। এ ধরনের পারিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাই-এর চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে, তারা চায় এক ছেলে ও এক মেয়ে। একথার আসল মানে, নিদেনপক্ষে একটি ছেলে। তারপর একটা মেয়ে হলেও ঠিক আছে। এসব পরিবার বেশ 'আধুনিক'। কেননা, তারা চায় সন্তান থাক যথেষ্ট বস্তুআত্তি, পুষ্টি, ভালো শিক্ষাদীক্ষার বাতাবরণে। বড়ো হলে সন্তান যেন সফল জীবনে থিতু হয়--ছেলের জন্য ভালো কাজ, চাকরি এবং মেয়ের সুখী বিবাহিত জীবন। ভাবাটা সহজ কিন্তু করে ওঠা বড়ো ঝকমারি। অনিশ্চয়তায় ভরপুর এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, বিশেষত কন্যাকে মানুষ করাটা তাদের কাছে গুরুভার ও উদ্বেগের বলে মনে হচ্ছে। এতসব ঝুটঝামেলা এড়াতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবারগুলির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে। তারা চাইছে না কন্যার জন্ম।

সরকারি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পরিবারগুলির কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে সরকার রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের কর্মসূচির মতো তার হাতের যাবতীয় উপায় অবশ্যই কাজে লাগাবে।আগেই বলা হয়েছে, এসব পরিবার কিছুটা সচ্ছল। তারা আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা সীমিত রেখে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাইয়ের চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের লক্ষ্য 'নিখুঁত' পরিবার---এক ছেলে এক মেয়ে। ২০১১-র জনগণনায় ধরা পড়েছে,বেশ কিছু রাজ্যে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সি কন্যাশিশুর অনুপাত কমে গেছে অনেকখানি। কন্যাশিশুর তথাকথিত কম উপযোগিতার ধারণা বদলাতে, বিশেষ করে রাজ্যস্তরে চালু হয়েছে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি।ক্রটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে কিছু চলতি প্রকল্প। বাল্য বিবাহ ঠেকানো, গরিব বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাবার জন্য উৎসাহ দেওয়া, আঠারো বছর বয়সের আগে তাদের বিয়ে না দেবার জন্য 'আপনি বেটি আপনি ধন'-এর মতো আছে অনেক সরকারি প্রকল্প। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে শর্তাধীন নগদ টাকা হস্তান্তরের প্রকল্প চলছে। নাম থেকেই বোঝা যায়, লাডলি ও ধন লক্ষ্মীর মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কন্যার জন্মের জন্য পরিবারকে উৎসাহ জোগাতে। কন্যার জন্ম, রোগ প্রতিষেধক (ইমুনাইজেশন), স্কুলে পড়াশুনোর কালে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বাংলার নবজাগরণের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

খাল নয়, বিল নয়, এতো সাগরে এসে গেলাম, এমন উক্তি করেছিলেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আর এই উক্তি করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। তিনি বলেছিলেন তুই তো বিদ্যার সাগর রে। আমাদের বিদ্যার মহান মানুষটি ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের পরিচয় করে দিতে ১৮৫৫ সালে বর্ণ পরিচয়ের প্রথমভাগ প্রকাশ করেছিলেন। অ থেকে চন্দ্রবিন্দুর চাঁদ ছাড়া কোনও লেখা সম্পূর্ণ হয় না। অকার, এ-কার, ই-কার, ঈ-কার ছাড়া কোনও লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই বর্ণ পরিচয় প্রকাশ করে তিনি সমগ্র জনজাতির কাছে শিক্ষার একটা পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষাই আমাদের আজও পথ দেখিয়ে চলেছে। এবং আগামী দিনেও পথ দেখিয়ে যাবে। এরই নাম শিক্ষা। যা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই আমাদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপহার। এই উপহারটা তিনি তুলে গেছেন। এমন একজন মানুষ যিনি ১৮২৮ সালে পিতার সঙ্গে পদব্রজে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৮৩৯ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি আন্দোলনে এসে বিধবা আইন পাস করিয়ে নেন। ১৮৫৬ সালের ১৯ জুলাই বিধবা আইন পাশ হয়। ১৮৬৭ সালে ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। ১৯ আগস্ট ১৮৭০ সালে তার পুত্র নারায়ণের সঙ্গে ভবসুন্দরীর বিবাহ দেন। তিনি বাংলাভাষায় যথার্থ শিল্পী এই সম্মানটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন। এক সময়ে ৬ মাসে গ্রামেতে ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ তিনিই স্থাপন করে গেছেন। বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৭৬ সালে কলকাতার বাগানের (বর্তমানে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। একসময় সাঁওতালদের মধ্যে বসবাস করে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতেই এগিয়ে এসেছিলেন। কার্মাটারের ওই এলাকায় তার নামে একটি রেলস্টেশন হয়েছে। এমন একজন বাংলার নবজাগরণের কথাই সেদিন মনে এসেছিল, সেদিন মানে ১০ অক্টোবর ১৯৯১ সালের শনিবার। সেদিন এই মানুষটিকে আবার সম্মান জ্ঞাপন করতে এগিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নুরুল হাসান। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, একসঙ্গে জয়ীর বন্ধনে বিদ্যাসাগরকে আবার শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আর এটাই তো দরকার। যারা দিয়ে গেছেন অমূল্য সম্পদের সন্ধান। আর এটাই এইভাবেই স্মরণে বরণে করতে হয় সম্মান। ১০ অক্টোবর ১৯৯২ সালে মন্দিরতলা এসে বিদ্যাসাগর সেতুর উদ্বোধন করে। মানুষের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যার যেমন কোনও শেষ বলে কথা নেই।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়